শনিবার, ২৩ ভাদ্র, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ৩৮

পুজোর মুখে সুখবর, রাজ্য সরকারি কর্মীদের ১৫ শতাংশ ডিএ ১ জানুয়ারি

পুজোর আগে আর্থিক প্রাপ্তি সকলের কাছেই অত্যন্ত সুখবর। এবার ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকারের শুভ বার্তা এল সরকারি কর্মচারীদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারি কর্মীদের ১৫ শতাংশ ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের এক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, আগামী ১ জানুয়ারি ২০১৮ তারা মহার্ঘভাতা পেয়ে যাবেন। এই ঘোষণা সরকারি কর্মীদের কাছে অবশ্যই সুখবর। কারণ মহার্ঘভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চাপা অসন্তোষ রয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ বৃদ্ধিতে কেন্দ্র রাজ্য মহার্ঘভাতায় বড় ফারাকের সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ'র তফাৎ ৫৪ শতাংশ। এই দূরত্বে স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কর্মীরা খুশি নয়। তবে রাজ্য সরকার কর্মীদের পুজো বোনাস, আগাম বেতনের কথা আগেই ঘোষণা করেছে। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, ২০১৯ সালের মধ্যে কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। হিসাব মতো এখন পর্যন্ত রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের প্রায় ৪১ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া পড়ে আছে। তবে রাজ্য সরকারের এই ঘোষণার পর তা কমে দাঁড়াবে ৩৯ শতাংশ।

অবশ্যই এই টাকা বড় অঙ্কের। কর্মীরা বকেয়া মহার্ঘভাতার প্রত্যাশায়। তবে কেন্দ্রের বিমুখতা বাম আমলের দেনা ইত্যাদিতেরাজ্যও যে নানাভাবে আর্থিক চাপের মধ্যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সরকারি কর্মীদের ও ঠিক সময়ে কাজে আসা, কাজ ফেলে না রাখা, মানুষকে হয়রানি না করার ব্যাপারটিও দেখতে হবে। এ রাজ্যে গত ৬-৭ বছরে কর্মসংস্কৃতির অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আরও উন্নতি দরকার। কারণ বহু ক্ষেত্রে সরকারি কর্মীরা দেরিতে আসা, সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানির বদভ্যাস ছাড়াতে পারেননি। এবিষয়ে তাদের সচেতন হওয়া দরকার। মহার্ঘভাতার পাশাপাশি ক্যালেন্ডার বর্ষে সরকারি কর্মীদের ছুটি বাড়ানোর কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বছর ছিল ২৭ দিন, আগামী বছর বেড়ে তা হবে ৩৫দিন। এটা আগে ছিল না। সুতরাং সবদিক থেকেই সরকারি কর্মীদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা সুখবর। কেবল ইউনিয়নের দোহাই আর চাপ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা উচিত রাজ্য সরকারি কর্মীদের। তাদের কাজ করতে হবে রাজ্যের স্বার্থে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীযুক্ত রামলাল হাজরা প্রভৃতি সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন,---'মহিন্দর!' 'মহিন্দর!' মাষ্টার তাড়াতাড়ি গিয়া কবিরাজকে ডাকিয়া আনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিরাজের প্রতি)—বোসো না—একটু শোনো। কবিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া উপবেসন করিলেন ও ঠাকুরের অমৃতোপম কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

নানা ছাঁদে সেবা—বলরামের ভাব—গৌরাঙ্গের তিন অবস্থা

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যায়। ''প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানা রূপে সম্ভোগ করে। কখনও মনে করে 'তুমি পদ্ম, আমি অলি'। কখনও 'তুমি সচ্চিদানন্দ, আমি মীন!'''প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে 'আমি তোমার নৃত্যকী!'—আর তাঁর সম্মুখে নৃত্যগীত করে। কখনও সখীভাব বা দাসীভাব। কখনও তাঁর উপর বাৎসল্যভাব—যেমন যশোদার। কখনও বা পতিভাব---মধুর ভাব---যেমন গোপীদের।''

''বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকতেন, কখনও বা মনে করতেন, আমি কৃষ্ণের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রকমে তাঁর সেবা করতেন।'' ঠাকুর প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা বলিতেছেন? আবার চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিয়া বুঝি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ---বাহ্যশূন্য। অর্ধবাহ্য দশায় আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথা কইতে পারতেন না। বাহ্যদশায় সংকীর্ত্তন।

দিনপঞ্জিকা

২৩ ভাদ্র, ভাঃ ১৮ ভাদ্র **৯ সেপ্টেম্বর**, ২৩ ভাদ্র, সংবৎ ৩ **আশ্বিন** বদি, ১৭ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৬। **শনিবার**, তৃতীয়া দিবা ঘ ৯।৫২ মিঃ। রেবতীনক্ষত্র দিবা ঘ ১।২৫মিঃ। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ঘ ৮।৪৮মিঃ। **বিষ্টিকরণ**, দিবা ঘ ৯।৫২ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ৯।৩ গতে বালবকরণ। **জন্মে**—মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ঘ ১।২৫ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৫৭ মধ্যে ও ১।৮ গতে ২।৪০ মধ্যে ও ৪।১৩ গতে ৫।৪৬ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।১৩ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২৫ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, দিবা ঘ ৮।৪০ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ঘ ৯।৫২ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ঘ ১।৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, দিবা ঘ ২।৪০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৫৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**—নাই। **বিবিধ**—চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৮।৪ গতে **নষ্টচন্দ্র দর্শন নিষেধ**। অদ্য কলকাতায় চন্দ্রাস্ত দিবা ঘ ৭।৫৭ গতে চন্দ্রোদয় রাত্রি ঘ ৮।৪ গতে। **শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের তিরোভাব দিবস**। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৩ ভাদ্র, ভাঃ ১৮ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর, ২৩ ভাদ্র, ১৭ জেলহজ্জ উঃ ৫। ২৪, অঃ ৫। ৪৬ শনিবার, তৃতীয়া দিঃ ঘঃ ৯।৫২।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

বর্তমান যুগযন্ত্রণার অন্তিম লগ্নের সন্ধানে

আশিসবরণ সামন্ত

সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত সেই উক্তি—'অস্যাং পৃথিব্যাং সুখী কঃ? যঃ অঋণী অপ্রবাসী চ' প্রশ্ন এবং উত্তর পাশাপাশি। বাংলায় বলা যায়—এই পৃথিবীতে সুখী কে? যিনি অঋণী এবং অপ্রবাসী। বর্তমানে সমাজ পরিবর্তন হতে হতে এমন জায়গায় পৌঁচেছে যে, যিনি প্রবাসী নন অর্থাৎ যিনি স্বদেশে নিজ বাসভবনেই বাস করেন এবং ঋণ তো নেই-ই বরং প্রভূত সম্পদের অধিকারী, তাঁকেও বলতে শোনা যায়— 'এযন্ত্রণা অসহ্য!' আবার পরক্ষণেই তিনি বলেন, 'কাকে আর কী বলব? ছেলেরাও আলাদা। ছেলের বিয়ে দিয়ে এ যে কী কালসাপ ঘরে আনলাম কে জানে!' সম্পদের প্রাচুর্যতার মধ্যেও হতাশা এবং গভীর মর্মবেদনা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। অপরদিকে কারও কারও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এক মুহূর্তও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছেনা। সবসময় মনোমালিন্য, কথাকাটাকাটি। পুত্র-কন্যারা একটু সাবালক হলেই বিশেষ করে ভালো চাকরি -বাকরি করলেই তাদের অনেকের কাছে বাবা-মা ব্রাত্য। হিংসা-দ্বেষ, অরুচিকর পণ্যৌগ্রাফিক আলোচনায় ঘরে বাইরে কানপাতা দায়। অফিস-আদালতে, ট্রামে, বাসে বড়দের সম্মান জানিয়ে কথা বলা তো আজকাল তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। নারীরা বিশেষত যুবতী-কিশোরীরা এমনকী শিশুকন্যারাও বাড়ির বাইরে একা একা বের হয়ে ধর্ষিতা না হয়ে ফিরে আসবে এমন ঘটনাতো পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নিজস্ব সম্বল বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। যে কোনো বয়সি পুরুষের সংযম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের ধারক-বাহকরা মাত্রেই যেন প্রতিবাদহীন ভোগ্য বস্তুর পর্যায়ে পড়ে। শিশু কন্যার নিরাপত্তা কিশোর-যুবকদের হাতে তো নেই-ই, উপরোক্ত প্রৌঢ়ের কাছেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিদ্বিত হয়। পারস্পরিক বিশ্বাস যোগ্যতা হারিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় হাঁটুন-দেখবেন শিশু থেকে শেষ বয়সি তা সে পুরুষ- মহিলা যে কোনও শ্রেণিরই হোক না কেন একসঙ্গে পাঁচজন গেলে তারা সবাই পাশাপাশি পথ হাঁটে, আগে পিছে নয়। পিছনের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে আসা পথচারিদের অসহায় অবস্থার কথা কেউ ভেবে দেখার অবসর পায় না। পিছনের পথচারীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। একটু সামনে পিছনে হেঁটে সহযোগিতা করার দিন শেষ হয়ে গেছে। মানুষের বিশেষতঃ নারীজাতির অরুচিকর পোশাক পরে, কেউ কেউ কেবলমাত্র গোপন অঙ্গটি ছাড়া যৌন আবেদনে সাড়া দেওয়ার মতো স্থানগুলি অনাবৃত রেখে পুরুষজাতির লালসার পথ তৈরি করে দেয়। কেউ আনন্দ পায়, আবার কেউ কেউ প্রতিবাদী হয়ে ছুরিকাহত হয় কিংবা নিহতও হতে পারে।

মানবিক মূল্যবোধ জীবন থেকে উধাও। শিক্ষার মূল আবেদনগুলি এখন আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। দু-তিনজন বুদ্ধিজীবী কিংবা চিন্তাশীল ব্যক্তি কাছাকাছি হলেই বিশ্রাম কিংবা আলোচনার মুহূর্ত যাই হোক না কেন সবটাই আরও একবার একরাশ জিজ্ঞাসার কিংবা হতাশায় পূর্ণ করে ফেলেন। একটি প্রচলিত কথার অর্থ খুবই ব্যঞ্জনাপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ। তা হল—অর্থই অনর্থের মূল। এখন অনেক মানুষের হাতে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর টাকা পয়সা এসে গেছে। যার ফলে মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যা খুশি তাই করে চলেছে। আত্মহনন ছাড়া অনেকেই আর কিছু করার কথা ভাবতে পারেন না। এটাই যেন তাদের চোখে বর্তমান সভ্যতার মূল সুর। বর্তমানে এই বহুমুখী যুগ যন্ত্রণার হাত থেকে অনেকেই মুক্তি পেতে চান, কিন্তু পথের সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন। তবুও করতে হবে। অনেক মত অনেক পথ থাকতেই পারে—অনেক মাধ্যম উঠে আসতে পারে যুক্তিবহুল আলোচনার মাধ্যমে। তার মধ্যে দুটি দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

এক ঃ দীর্ঘমেয়াদি একটি পরিকল্পনা, এবং তা হল উপযুক্ত মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাগ্রহণ। শৈশব থেকেই উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার এই প্রকল্প যদিও দীর্ঘমেয়াদি তবুও পাকাপোক্ত। এর জন্য প্রয়োজন মনীষী তথা বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন চর্যা, জীবনে বড় হওয়ার গল্প পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিটি শিশুকে কাছে তুলে ধরা। হিতোবাদেশের গল্প, কিছু নীতি শিক্ষার কথা তুলে ধরা প্রয়োজন। আসলে শৈশবটা যদি শক্তপোক্ত না হয়—তাহলে পরিণত বয়সে তা তো আলগা থাকবেই। মানবিক মূল্যবোধের এই শিক্ষার আবেদন যে কত গভীর এবং শক্তিশালী তা একবার ভেবে দেখুন তো। আজ থেকে দেড়শো বছরেরও বেশি আগে একজন গ্রাম্য মহিলা, যিনি খুব কম লেখাপড়া শিখেছিলেন অথচ, বর্তমানকালের গবেষকদের গবেষণার খোরাক হতে পেয়েছেন তাঁর মূল্যবান একটি বাক্যস্বরূপ—'যদি শান্তি চাও ,তো কারও দোষ দেখোনা মা, দোষ দেখবে নিজের'—এই আত্মসমালোচনার শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেককে চমকে দিয়েছেন। তিনি আর কেউ নন—বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রামের শ্রী শ্রী মা সারদামণি। আত্মসমালোচনার এই সতর্কবাণীটিই আজ সমস্ত প্রকার শান্তিলাভের একমাত্র সোপান। এই শিক্ষাপর্যায়ে লোকশিক্ষাকে আশ্রয় করতে হবে। প্রাচীনকালে নাটকের মাধ্যমে, যাত্রাগানের মাধ্যমে, বাউল, রামায়ণ গান, তরজার মাধ্যমে যে লোকশিক্ষা ত্বরান্বিত হত তা অনুসরণ করতে হবে। আসলে আমরা অনেকেই জ্ঞান পাপী। সব জেনে শুনেও না জানার ভান করি। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই শিক্ষা দ্রুততার সঙ্গে সংগঠিত হয়। ছোট বড় সভাসমিতি, সাহিত্যানুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান সহ এই মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিস্থাপন এমন কি উত্তরণে বিশেষভাবে কাজে লাগবে। দ্বিতীয় দিনটি হল, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ। যা খুব দ্রুত কার্যকর হবে। এর ফল অবশ্য সুদূরপসারী না হোক, কাজ শুরুর পক্ষে সহায়ক হবে। পথ চলতে জানে না যারা তাদের সাময়িকভাবে গতিরোধ করে পথচলার নিয়ম জানানো যেতে পারে। এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অথবা বাজার সংলগ্ন স্থানে শিবিরস্থাপন করে নিয়মমেনে পথচলার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে প্রতিটিক্ষেত্রেই প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। যে কোন পুজো অনুষ্ঠান বা সামাজিক অনুষ্ঠানে তথাকথিত ডি.জে বা অন্য কোনো কদাকার শব্দদানব-এর গতিরোধ তো প্রশাসন ভিন্ন সম্ভব নয়। সবাই জানে এবং বোঝে তবুও রাজনৈতিক কারণেই সবাই চুপচাপ। এককভাবে প্রতিরোধ করতে গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি। এখন প্রশাসনই রোধ করতে পারে। প্রয়োজনে সর্বদল বৈঠক ভেবে গ্রামীণ প্রতিনিধিদের বেছে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা যেতেই পারে। সামাজিক বিকারের গতি ত্বরান্বিত করতে যাঁরা এই সংঘাতে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন বা আসবেন তাঁরা সহৃদয় হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলেই অদূর ভবিষ্যতে আমরা সাফল্যের আলো দেখতে পাব এবং এই যুগযন্ত্রণার হাত থেকে সাধারণ মানুষও অব্যাহতি লাভ করবেন।

সত্যবিমুখতা ও চারিত্রিক সংকটই নিবৃত্তিমূলক জীবনলাভের অন্তরায়

(শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শের ভিত্তিতে প্রস্তুত)

গদাধর রানা **শেষ পর্ব**

সাধকভক্তের মুক্তি ত্বরান্বিত হয়। সত্য হয় তার জীবনসাথী। কিছু সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ সৎ যা তিনকালে আছে অথচ দৃষ্ট হয় না; অসৎ যা নাই দেখা যায় না; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন,—''মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়।'' মিলনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন শ্রদ্ধা তারপর প্রীতিপূর্বক হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে ভাববিনিময়। পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ক'রে নয়, সকলের বৈশিষ্ট্য স্বীকার ক'রে অপরের উৎকর্ষ দ্বারা নিজের অপূর্ণতা দূর ক'রে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা এক পূর্ণতর ধর্মসাধ্যে প্রশস্ত যাত্রার পথ উন্মুক্ত করতে হবে, যে পথে নিজ নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস আদর্শ নিয়ে নিরাপদে চলতে পারবে আগামীকালের উন্নততর মানবজাতি। মনকে সৎ করতে হবে, সৎ লোক হ'লে চিত্ত শুদ্ধ হ'বে সত্যকে সত্য ব'লেই গ্রহণ করবে। তা যদি না করে, তবে সত্যে ও অসত্যে দ্বন্দ্ব চিরকালই থাকবে জগতের বৈচিত্র হয়ে। সত্যের সমর্থনে তাইতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিতে বলেছিলেন ঃ

''মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়
বুঝিব সত্য, পুজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন।'' (বিচিত্র পর্যায়)

ঐ একই সত্যের পথ চলার পক্ষে শ্রীভর্তৃহরি বললেন ঃ

''নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু
লক্ষ্মী সমাবিশতু গচ্ছতুবাযবেষ্টম্
অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দন্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং— ন ধীরাঃ।'' (লিপিশতকতম্)

বৃহদারণ্যক বলছেন ঃ '' যা বৈ ধর্ম সত্যং বৈ তৎ''—যাহাই ধর্ম, তাহাই সত্য। আমরা সুখের সন্ধান করি, কিন্তু সুখ কোথায় ? ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছে—''যো বৈ ভূমা তৎসুখম্ নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।'' স্বামীজী বলেন, ''সমগ্র বিশ্ব মানুষের শক্তিতে, উৎসাহের জোরে এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে সৃষ্টি হইয়াছে।'' এখানেও সত্য ছাড়া কখনই উচ্চতর সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হ'ত না। সত্যস্বরূপ আত্মা সম্পর্কে আচার্য শঙ্কর বললেন ঃ

''অতঃ পরং স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রত্যাগাত্মা ন চেতরঃ।''

—জীবাত্মাই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। সনাতন তথা সত্যাশ্রয়ী জীবনলাভের সন্ধানে উপনিষদ বিদ্যা দেয় ঃ—

'' পিতৃরঃ অপি অধিকামাতা গর্ভধারণপোষণাৎ
তস্মাদ্ ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমগুরু।''

—পিতার চেয়েও মাতা বড়, মাতার তুল্য গুরু আর জগতে নাই। কিন্তু দুঃখ এই—সনাতন এ সত্যটুকুকে আমরা জেনেও অবহেলা করি। সত্যাশ্রয়ী চিত্তে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,— ''জ্ঞানের অধিকার যার উপর তা চক্ষল, কিন্তু প্রেমের অধিকার তা ধ্রুব সত্য।'' চাই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রার্থনা—এই তিনের সমন্বয় ঘটলে ভগবৎসংযোগ দ্বারা সাধক ভক্তের মুক্তি ত্বরান্বিত হয়। সত্য হয় তার জীবনসাথী। কিছু সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ সৎ যা তিনকালে আছে অথচ দৃষ্ট হয় না; অসৎ যা নাই দেখা যায় না ; মিথ্যা হচ্ছে যা নাই অথচ দৃষ্ট হয়, যেমন রজ্জুতে সর্প বা কিনা, কিন্তু দেখা যায়। সত্য হচ্ছে যার অস্তিত্ব আছে এবং বিকাশ আছে। প্রিয়, অপ্রিয়, সত্য, মিথ্যাবলম্বনেও নানাভাবে শাস্ত্রসম্মত সূত্র আছে ঃ

''সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আক্রোশকর্ষন্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ''— মহানির্বাণতন্ত্র, ৮।৬২।

মিথ্যা সম্পর্কে মহানির্বাণতন্ত্রে বলেছে ঃ

'' বিদ্যাধনযশোধর্মান্ যতমান্ উপাজ্জয়েৎ
বাসনক্ষাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ।''(২।৫৮)

এমনকি বিষ্ণুপুরাণেও প্রিয় ও সত্য সম্পর্কে উপদেশে বলা আছে ঃ

''প্রিয়ং যুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ
শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্।'' (৪৪)

—বাক্য হয়তো প্রিয় বা সত্য হতে পারে, কিন্তু তা যদি হিতকর না হয়, তাহলে বলবেনা। অপরদিকে ক্ষেত্রবিশেষে বাক্য অপ্রিয় হলেও যদি তা হিতকর হয় তাহলে বলা ভালো। এই প্রসঙ্গেই শাস্ত্রে আরও এক সূত্র আছে ঃ—

''যত্র ভবেৎ সত্যম্ অব্যক্তম্ অনৃতং ভবেৎ
তত্র অনৃতম ভবেৎ সত্যম্ সত্যং চ অপি অনৃতং ভবেৎ।'' (মহাভারত, কর্ণপর্ব ৬৯।৩২)

—যেখানে সত্যবচনের পরিণাম, মিথ্যাবচনের ন্যায় অনিষ্টকর, অথবা একই অর্থে মিথ্যাবচনের পরিণাম, সত্যবচনের ন্যায় মঙ্গলকর হয় তাহলে মিথ্যা বলায় শ্রেয়, সত্য বলা উচিত নয়। আমরা জানবাজারের রাণী রাসমণির বাড়ির একটি ঘটনা অবতরিত আছি। চন্দ্র হালদার নামে রাণীরই আশ্রিত এক লোক একদা বাস্তবিকই বিনাদোষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দারুণভাবে বুটের লাথি মেরেছিল। রক্ষী প্রহরীদের চোখ তা এড়ায়নি; তারা তো ক্ষেপে আগুন রাণীমাকে এই গর্হিত ব্যাপারটি বলে দেবে ব'লে। ঠাকুর কিন্তু চন্দ্র হালদারের কৃত অপরাধকে রাণীমাকে বলতে সকলকে নিষেধ করেছিলেন। ঐ সত্যটুকু বললে চন্দ্র হালদারের চাকরি যাবে। তাই ঠাকুর বিষয়টিকে হাল্কা ক'রে রাণীমাকে বলার জন্য সবাইকে অনুনয় করেছিলেন, যাতে কেউই কম্পিত না হয়। তাহলে সে যে বড়ো অকল্যাণকর হবে—যা প্রেমময় ঠাকুর মনেপ্রাণে চাননি। তাই প্রয়োজনে হিতকর উদ্দেশ্যে মিথ্যাকেও ব্যবহার করতে হয়। পরিশেষে রাণীমার এস্টেটে তাদের কারও চাকুরি যায়নি। এই হচ্ছে প্রিয়, অপ্রিয়, সত্য, অসত্যের সকল প্রয়োগ। শাস্ত্রে আরও বলেছে ঃ

'' সত্যং ব্রূয়াদ্, প্রিয়ং ব্রূয়াদ্, মা ব্রূয়াদ্ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ, এষ ধর্ম সনাতনঃ।'' —শুক্রনীতি

—সত্য বলবে, প্রিয় বলবে। অপ্রিয় সত্য বলবে না। আবার প্রিয় বাক্য হলেও মিথ্যাকথন নৈব নৈব চ। কেননা, এধরণের মিথ্যা কোনোভাবেই সমাজের হিতে লাগে না। আসল কথা, সবার আগে চিত্তশুদ্ধি চাই। পাওয়ার আসক্তি থেকেই অহংকার আসে। কর্তৃত্ববোধ আসে। সাধারণ ব্যক্তি আমি/আমার অভিমান দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অহংকার-রহিত হন। তেমন ব্যক্তি ক্ষুদ্র জড় জগতের কিছুই প্রত্যাশা করেন না। একেই বলে সৎচরিত্রযুক্ত আত্মদর্শী ব্যক্তি। তিনি বিশ্বাস করেন—যাবতীয় কর্মপ্রকৃতি দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এভাবে ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টি হ'লে অসত্য অনেকাংশেই অপসৃত হবে, চরিত্রসংকটের নিরসন ঘটে এক বৃহত্তর কাঙ্ক্ষিত বিশ্বজীবনলাভ সম্ভব হবে।

পূজ্যপাদ স্বামীজীর ভাষায় সবশেষে বলতে হয় ঃ—

''মম গতি নাহি জানি
তব গতি তাহাও না জানি
কেবা চায় জানিবারে—শুধু এইটুকু জানি
দাস তব দোঁহাকার সশঙ্কিক নমি তব পায়।''

সম্পাদক সমীপেষু

সর্ ফরোসী কি তমন্না অব্ হমারে দিল মে হ্যায়

একজন বিপ্লবী যখন বুঝে গেছেন, কালকের প্রভাতে আবার সূর্য্য উঠবে। আবার আলোয় ভরিয়ে দেবে জগৎটাকে। তখন কালকের প্রভাতে আমার জীবনে একটা অন্ধকার নেমে আসছে। তা জানা সত্ত্বেও তিনি গোরখপুর জেলের কনডেমড সেলে বসে গান লিখছেন। কতখানি মনের জোর আর কত বড় রকমের দেশভক্তি। তাই তিনি মৃত্যুর আগের দিন একটি গানের রচনা করে ফেললেন। কেন এই গান তিনি লিখলেন? শেষবারের মতো নিজের পুত্রের কাছে দেখা করতে গেলেন তাঁর মা। একমাত্র সন্তানের সাথে তাঁর যে সেটাই শেষ দেখা ছিল। তিনি একটু ভেঙ্গে পড়েছিলেন এই অবস্থা দেখে। তাঁর মা নিজের সন্তানকে সাহস দিয়ে বলেছিলেন, আজ আমি খুব গর্ব বোধ করছি। আমি এমন একজন সন্তানকে জন্ম দিয়েছি যে,সে ভারতমায়ের শ্রীচরণে জীবনটাকে উৎসর্গ করতে চলেছে। আমি তো জন্ম দিয়েছি, তাই তোর মা। কিন্তু যে মাটিতে গায়ে ধুলো মেখে তুই বড় হয়েছিস , সেটা তো ভারত মাতার স্পর্শকরা মাটি। তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষটাই তোর মা। সেইসময়ের জন্যই জীবনটাকে তুই উৎসর্গ করে যাচ্ছিস। এটা তো আমার গর্বের কথা। তোর মত একজন সন্তানকে গর্ভে ধরে আজ আমার গর্ভটাকে ধন্য মনে করছি। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো। ততদিন তোর মত একবীর সন্তানের মা হিসাবে নিজেকে ধন্য মনে করবো। সবাই তো ঠাকুরের গলায় মালা পরিয়ে মাকে আরাধনা করে। আমি না হয় তোর ছবি রেখে ওই কাজ করবো, আজ থেকেই তুই আমার ইস্টদেবতা। তোর পুজা করলেই আমার ভগবানের পুজা করা হবে। আর তুই চলে যাবার পর এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলবো না, যতদিন না ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায়। যেদিন বিদায় হয়ে যাবে, পা-পীদের অপবিত্র করা ভারতবর্ষটাকে পরিষ্কার করতে জল লাগবে, সেই জলটা আমি চোখের থেকে এনে ধুঁয়ে দেবো। আর পবিত্রময় করে দেবো সমগ্র ভারতবর্ষকে। এই কথাগুলোই সেদিন রামপ্রসাদ বিসমিলকে প্রেরণা দিয়েছিল। ১৮ ডিসেম্বর তিনি লিখে ফেললেন এমন একটা গান। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে ফাঁসির মঞ্চে যাবার আগে তিনি গেয়ে উঠলেন ' সর্ ফরোসী কি তমন্না অব্ হামারে দিল মেঁ হ্যায়/ দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাজু এ/ কাতিল মে হ্যায়'।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দপ্তর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়